আয়েশা খাতুন

লাচিত কথা

স্রোতের স্বপক্ষে লাশ-ই ভাসতে পারে

স্রোতের বিপক্ষে অস্তিত্বের চেতনা ফেরে

সুতরাং সে অস্তিত্বের লড়াই বার বার আমাদের রণভূমিতে আনতে বাধ্য করে। আমার দেশ কোথায়? এক জন নারী হিসেবে সেই শব্দটা তসবীর মালার মতো দুই আঙুলের ফাঁকে এসে থমকে যায়। সত্যি সত্যি ভাবতে থাকি আমার দেশ কোথায়! জন্মের জন্মভূমি আমার জন্য জায়গা রাখেনি। উদ্বাস্তু জীবন মেয়েদের। এরা যতই ধরমের ঠিকাদারের নামে তাদের কুকর্মের কথা বলুক না কেন মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ন্যায় নেয্য কথা বলার দল আমরা মেয়েরা আজো গড়তে পারিনি। আসাম প্রদেশের কথা ভাবলেই নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন আসে। পার্বত্যভূমি আসামকে বা পার্বত্য ভারতকে ভারতীয়রা কতটা ভালোবেসেছে নিজের দেশ বলে? অথবা বলা যেতে পারে উত্তরে কাশ্মীর থেকে পূবের আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর এমনকি দার্জিলিংকেও যদি ধরি তাহলে এক বাক্যে একটা কথা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় যে, এই সমস্ত প্রদেশগুলো কেবল ভারতের মানচিত্রের বিস্তৃতি ব্যাপ্তির এক প্রকাণ্ডতা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু এইটুকুই ভারতীয় এবং বর্তমানে প্রকট হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ। দেশ হামারা হ্যায় ভারত পিয়ারা হ্যায়। কিন্তু এই পার্বত্য ভারতের মানুষ, মাটি, কীটপতঙ্গ যে হামারা পিয়ারা হ্যায় এই কথা বলতে আমাদের আটকায়, যখনই আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে ধর্ম, জাত, জাতি, পুরুষ, মহিলা, আদিবাসী, সংরক্ষণ। এ এক অসভ্য শ্লোগান। "আমাদের মতো হতে হবে, আমাদের মতাদর্শের হতে হবে, আমাদের ঈশ্বরের হাতের তৈরি হতে হবে, তবেই পাশে জায়গা দেওয়া যাবে। যদি এই সবকিছুই না মেলে তাহলে দেশ থেকে তাড়াও বিদেশি বলে, যদি না যায় তাহলে মারো, জখম করো, বলাৎকার করো, গরিব হলে দলিত হলে সংবিধানে ফেলে ফাঁসি দাও আর চিৎকার করে বলো "হাম হিন্দু হুঁ আওর হিন্দুস্থাঁ শ্রিফ হিন্দু কা হ্যায়।"

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমি আসাম গেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল আসামের মহিলারা কেমন আছেন এবং বিজেপি সরকার এনআরসি'তে জনগণকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের সহজ জীবন যাপনের ছন্দকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, সেই মানুষেরা কোথায়? কিভাবে? কেমন আছেন?

গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে চলে আসছি উত্তর গুয়াহাটির দিকে। পাশে পাশে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে দেখা এবং তারই তীর ধরে চলে আসছি। প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে মূর্তিগুলো তাদের দেখার জন্য নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বিপরীতে উঠে দাঁড়িয়েছে এক ঝাঁক ফুকন তরুণ, সারা দেহ জুড়ে প্রবল পেশীশক্তির প্রকাশ, হাতে বিশাল ভুজালি, তরবারি, বল্লম নিয়ে মরণরণে নামবে। কাউকেও জিজ্ঞাসা করিনি এঁরা কারা? কি করেছিলেন দেশের জন্য? নীচে কিছু লেখা ছিল পড়তে পারিনি, সম্ভবত "মমাইকাটা...." চোখে পড়ল সেই স্ট্যাচু।

কিছুক্ষণ তো মাথায় থেকে গেছিলো সেই স্ট্যাচুর কথা। তারপর সেখান থেকে সোজা গেলাম এক সমাজকর্মী এবং ডকুমেন্টরি ফ্লিম মেকার রেহেনাদির বাড়ীতে। সেখান থেকে নিয়ে গেলেন লাচিত ক্লাবে। গুয়াহাটিতে ক্লাবচর্চা আছে। এখানে মেয়েদেরও অনেকগুলো ক্লাব আছে, কোথাও সমধর্মের মানুষের, কখনোও বিসমধর্মের মানুষের ক্লাব। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই এই ক্লাবচর্চাতে। লাচিত ক্লাবের সদস্য রেহানাবাইদু (দিদি)। সেখানেই জানতে পারলাম ক্লাবের নামকরণ লাচিত কেন?

দেশ প্রেম বলে কথা! পাহাড়িরা কি সহজে কারো কাছে বশ্যতা মানে? নিশ্চয় না। তারাও তাদের পাহাড়কে প্রাণাধিক ভালোবাসে, আর ভালোবাসা মানে তো শুধু চোখের জল নয়। চালাকি করে দেশ প্রেম নিয়ে দু'কলম লিখে দিলাম এবং নিজেকে সেফসাইডে রাখলাম, "সাপও মলো লাঠিও ভাঙলো না" তাতো নয়। সেই দেশ প্রেমের সংজ্ঞা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসমিয়ারা মেনে চলেছে। তারই প্রমাণ দিতে লাচিত নিয়ে একটুখানি না বললেই নয়।

লাচিত বরফুকন, এক জন দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা তরুণ। যাঁর কাছে দেশের চেয়ে আত্মীয় বড় হয়নি। এই লাচিতের পদ ছিলো বরফুকন, ফুকনদের উপরের পদে অধিষ্ঠিত। ফুকন হচ্ছে দেশ রক্ষীদের নাম। ফুকনদের উপরে বরফুকন। লাচিত ছিলো বরফুকন। ১৬৬৯ সালে আসামের রাজার কাছে খবর ছিল মুঘলরা আসাম আক্রমণ করতে আসছে তাই লাচিতকে দায়িত্ব দিয়েছিলো শত্রুকে প্রতিহত করার। লাচিত ব্রহ্মপুত্রের তীরে দুর্গ গড়ার কাজ শুরু করেন তার দলবল নিয়ে। কিন্তু সময় কোথায়? হাতে সময় মাত্র এক রাত্রি! এমন সময় লাচিত ফুকন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফুকন ব্রহ্মপুত্রের তীরে বাঁশ কাঠের দুর্গ গড়তে গড়তে প্রায় জ্ঞান হারানোর উপক্রম। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ গড়ার কাজ শেষ করার দায়িত্ব দিলেন তাঁর মামাকে এবং লাচিত ফুকন অসুস্থতার কারণে ওইখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হবার পথে এমন সময় লাচিত ফুকনের চৈতন্য ফেরে, তিনি দুর্গের কাছে এসে দেখেন দায়িত্ব প্রাপ্ত মামা আরামে ঘুমাচ্ছেন। লাচিত কাল বিলম্ব না করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মামার গলাকে এক পোঁচে কেটে ফেলেন এবং দুর্গ তৈরি করে মুঘলদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন। মুঘল সেনাবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। লাচিত নিজের প্রাণকে বন্ধকী রেখে আসামকে বাঁচিয়েছিলেন পরাধীনতার গ্লানি থেকে।

এই লাচিত তাই আসামের মানুষের কাছে শক্তির প্রতীক, মনোবলের আইকন, সারা আসাম জুড়ে লাচিত দিবস পালন করে আসামের মানুষ। আমি এই লাচিত ক্লাবেই শুরু করলাম এনআরসি নিয়ে কথা বলতে। যে সমস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা সকলেই যে সরকারি চাকুরি করে তা নয় অনেকেই ব্যবসাও করেন, অন্য কাজের সঙ্গেও যুক্ত আছেন। তাদের বক্তব্য সদ্য আসা আসামের বিজেপি সরকার যা করছে তা খুবই অন্যায়। আসামের মানুষ, সাধারণ নাগরিক যাঁরা প্রতিদিন আসামকে শান্তির বাতাবরণে রেখে আপন জীবন জীবিকা অতিবাহিত করেন সেই আসামের বাসিন্দারা ভারতীয় বাঙালি বা বাংলাদেশি বাঙালি খেদাওয়ের বিরুদ্ধে এমন কথাই প্রকাশ করলেন।

পরের দিন আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন আর একটি ক্লাবে, এই ক্লাবের মেয়েরা সকলেই মুসলিম ঘরের। এঁরা ক্লাব চালান। তাঁদের জাকাতের টাকা থেকে ক্লাবের কাজের খরচা বহন করে থাকেন। অনেকটা সহজ কাজ। ধরমের কাজ বা বলা যেতে পারে গরিবদের সেবা। স্রোতের স্বপক্ষে কাজ। বড়ই মিঠে এই কাজ করা। তবুও একটা উল্টো স্রোতের মুখোমুখি হতেই হয় মহিলা হিসাবে। তাঁরা ডেকেছিলেন শুনতে ও বলতে "উইম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট এবং ইসলাম"। শুরু করেছিলাম ইসলামের হিসাবে মহিলাদের ল্যান্ড রাইটস নিয়ে। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার এবং স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশ কতটা?

আসলে ভবের ঘরে ফাঁকি থাকলে যা হয়, সব জেনেও কিছু জানি না বা কিছুই জানি না। সরাসরি আত্মসমর্পণ। যাতে তেমন করে আর মমাইকাটার শুরুর গল্প শুনা যায় না। তবুও একটা মহিলা সমাবেশ। এই মহিলাদের সমাবেশে বাংলার মহিলার ক্ষমতায়ন মেলাতে এসেছি আসামের মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্টের সঙ্গে। বাঙালি হিসাবে আমারও লজ্জা আছে, কত কথাই না শুনিয়েছি বাংলার সাঁওতাল দলিত আর গ্রিব মুসলমানদের। দেশ যে আমরা কত ভালোবাসি আর সেই ভালোবাসার দেশে এই ছোটলোকগুলো কত যে নোংরা করে। এদের দেশ থেকে বার করে দেওয়া উচিত এদের জেলে রাখা উচিত এদের অন্ধকারে ভরে রাখা উচিত এদের দাঁড় করে গুলি করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও এনআরসি ক্যাম্পগুলোতে যাব ভাবছি। এই মহিলারা সকলেই যুগে যুগে আসামের বাসিন্দা। তাঁরা কি বলেন এমন অমানবিক বাঙালি খেদাও নিয়ে? মহিলারা কোনদিনই যুদ্ধের পক্ষে নয়, কোন দিনই ধ্বংসের পক্ষে নয়। আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তরে তারা সকলেই বলেছিলো আমার অনেক বন্ধু বাঙালি, উপস্থিত অনেক বাঙালি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো আসামের সকলেই তো আর বাঙালি খেদাও অভিযানে নামেনি। এই কাজ বিজেপি সরকার করছে আর বিজেপি সরকার আমাদের মধ্যে কেবলই সাম্প্রদায়িক বিভেদ ঘটানোর চেষ্টা করছে। তবে তারা পারবে না। তাদের কাছে জানতে চাইলাম এখানে কি গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে? তারা জানালো আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গরুর মাংস খাই। ঠাণ্ডার জায়গা শীতল দেশে গরুর মাংস বাঁচার উপকরণ। আসামে বেশীর ভাগ মানুষ গরু খায়। এখানে ওইসব বদমাইসি করতে পারবে না। যাই হোক তারা হয়তো বিজেপির হিংস্রতা এখনো আঁচ করতে পারছে না। বন্যার জল উপরে উঠতে সময় লাগে। আমি বেশি কিছু বলিনি।

ভুলে গেলে চলবে না আমি বাঙালি মানুষ এবং আমিও কত ভাবে আক্রান্ত বাংলার মাটিতে। আমি যখন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি, বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে বলি, "হাম বাঙালি হুঁ।" কিন্তু আমার মাটিতে আমার উল্টো দিকে যারা হুঙ্কার ছাড়ে তারা বলে, "তুম বাঙালি নহি, মুসলমান হো।" আমি তখন তড়িঘড়ি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি কিন্তু তার আগেই বেশ কয়েকটি ঢিল এসে গায়ে লাগে। আপনার নাম আয়েশা ক্যান? জল কে পানি কন ক্যান? এই সব বাঙালির চিহ্ন না। এই যে এই ডে হচ্ছে বারত মানে ইনডিয়া, এই ডে তুমাগ দ্যাশ না, তুমি বাগ নিয়েসো পাগিস্তান যেও। মানে? যুগে যুগে বীরভূমে বাস করে আসছি, মূল নিবাসী থেকে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ধর্ম পালটে দিয়েছি, কিন্তু ভিটেমাটি পালটে দিইনি। সাঁওতাল ছিলাম তখনও কচুকাটা করেছিস, মুসলমান আছি বলে সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছিস, এখনো কচুকাটা করছিস তবুও আমার দিশমের ব্রত (মেঝে) ছাড়িনি। আর তুই নিজের দেশে আগুন লাগিয়ে নিজের জন্মভূমির মাটিকে দশ বার দশটি মানুষের কাছে বেচে ১৯৯৮ সালে পালিয়ে এসে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে রাজনীতির চাদরে নিজেকে আবৃত করে আমাকে প্রশ্ন "তুমি কে ডা? ভারত তুমাগ দ্যাশ না।" আবার আমাকেই বলিস কি আমি মুসলমান! আমি বাঙালি না? চমৎকার!

আমি আমার মাঝে এই দ্বিধা নিয়ে ওই আসামের মেয়েদের দলের কাছে প্রশ্ন করতে গেছি আপনারা বাঙালীদের কোন নজরে দেখেন? নিজের কাছেই রেখেছি স্পর্ধার এক খরতরবারি।

আসামি বাঙালি বিহারি খেদানোর গল্প আমার ভারত জুড়ে আসামের এনআরসি, আর সেই সঙ্গে সবে ঘটে যাওয়া রোহিঙ্গা হত্যার সঙ্গে খেদানো, ওদিকে গাজার শিশু নিধন, আমেরিকার শিশুচ্ছেদন মিলে

এই মানুষ খেকো খবিশগুলোর (ভয়ঙ্কর অদৃশ্য জীব) সঙ্গে। যখন দেশে কুশাসন আসে তখন জানতে হবে এই কুশাসকদের বিদ্যালয় তৈরি আগেই ছিল তা না হলে এমন কুমানুষগুলো এক সঙ্গে বার হলো কোন উদর থেকে। অকাশ থেকে পড়েনি তারা। আমরা কি ঘুমাচ্ছিলাম না সব কিছু জেনেও? আমরা নিজের ফাঁদ নিজেই পেতে রাখিনি? এর উদাহরণ ভুরিভুরি আছে, যেমন ভারতের সম্পদ ধ্বংস করতে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেছি। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ক্রিকেটার আজহারউদ্দিনকে নিয়ে। তার বিরুদ্ধে কি ভয়ানক অভিযোগ আর এক জন ক্রিকেটারের। দীর্ঘকাল মামলা চালিয়ে প্রমাণ হলো যে আজহার অপরাধী নন। তাহলে এত এত অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনলো কি করে? এই যে আজহার অপরাধী নয় এ কথা কোর্ট বলল, কিন্তু আজহারের এতগুলো দিন নিঃশেষ! কিভাবে তাঁর প্রিয় ক্রিকেট জগত থেকে বঞ্চিত রেখে তাঁকে মুচড়ে দিল। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে? সবই সম্ভব এদেশে।

কলেজে পড়াকালীন দেখেছিলাম কলেজের এক ছাত্রনেতার চরিত্র। অকারণ প্রিন্সিপ্যালকে দুমদাম মারলো। তারপর প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে চোখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল। প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় ভাঙা শিরদাঁড়া নিয়ে কলেজ থেকে অবসর নিলেন। আসলে যে কথা বলতে এই লেখা তাহলো মানবাধিকার নিয়ে কথা। আসামের চল্লিশ থেকে সত্তর লক্ষ মানুষ ক্যাম্পে আছেন। তাদের জমিজমা ঘরদুয়ার সব পড়ে আছে। তাদের শরীর স্বাস্থ্য, তাদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া সব বন্ধ। এবার প্ল্যানিং কি তাহলে নো ম্যান্স ল্যান্ডে তাড়িয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা? যেমন কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া পর পর পাঁচ জনকে ডেকে অকারণ গুলি করে হত্যা করেছিল। কি মজার খেলা বিজেপির।

এই ক্যাম্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। ২০০০ সালের মে মাস। আমি একটা রিপোর্ট করার জন্য আসাম গেছিলাম এবং থেকেছিলাম তিন মাস। সেই সময় আসামে ঘটে গেছিলো আর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ছিল না। সেটা ছিল বোরো ও সাঁওতালদের জাতিদাঙ্গা। হাজারে হাজারে সাঁওতালকে বোরোরা কেটে ভাসিয়ে দিয়েছিলো শঙ্খ নদীর জলে। শিমুলটাপু গ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম সেই সব কথা। দাঙ্গা প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। বোরোরা ফিরে গেছে নিজেদের গ্রামে কিন্তু সাঁওতাল মানুষ ফিরতে পারছে না ক্যাম্প থেকে নিজের ঘরে। এদিকে ক্যাম্পগুলোও ভেঙে যাচ্ছে, বাচ্চাদের পড়াশুনা নেই, খাওয়া দাওয়া প্রায় অনিয়মিত, মানুষেরা কাতারে কাতারে টিউবরক্লোরেসিস রোগে আক্রান্ত। কত জন মানুষ টিবি রোগাক্রান্ত এবং তারা কি ভাবে সুস্থ হবার উপায় বের করেছে? শুধু তাই না সাঁওতাল মানুষ কেন নিজেদের ঘরে গ্রামে ফিরতে ভয় পাচ্ছে? এই সব রিপোর্ট করার জন্য লুথারান ওয়ারল্ড সারভিস পাঠিয়েছে আমাকে। আমি একা যায়নি। লুথারান তখন এমারজেন্সি কাজ শুরু করেছে আসামের কোঁকড়াঝাড় জেলার গোঁসাইগাঁও সাবডিভিশন এলাকাতে। চারিদিক থমথম করছে, যেখানে সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প। আমি গেছি সেই সব ক্যাম্পগুলোতে যেগুলোতে বসে করছে সাঁওতাল মানুষ। খাবারের সন্ধানে গেছে কিছু মানুষ, কেউ কেউ গেলো তাদের গ্রাম খুঁজতে। পুড়ে যাওয়া গ্রামগুলোতে আমাকে নিয়ে গেলো, আমি সাঁওতালদের পুড়ে যাওয়া ঘরের ছাই মাটিতে বসে আছি। মানুষগুলো ছাই মাটি খুঁড়ে ঘরের জিনিসপত্র বার করছিল। দেখছিলাম ওদের ভালোবাসার নানা আসবাবপত্র পোড়া লাশের মতো বার হচ্ছিল আর ওরা আমাকে এক একটা আসবাবপত্র কি করে কিনেছিল সেই সব কথা বলছিল। শোনাচ্ছিল গ্রামে কিভাবে আগুন লাগাচ্ছিল। কিভাবে শঙ্খ নদীতে তীর বিদ্ধ হয়ে সাঁওতাল ভেসে যাচ্ছিল। এইসব কথা শুনতে গিয়ে আমি ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। ওদের চোখ ভিজে যাচ্ছিল না। ওরা কেবলি কান্নাকে তাড়াচ্ছিল কখনো ফাবড় মেরে সুপারি গাছের কাঁচা সুপারির ঝাড়ে মারছিলো, আঘাত পেয়ে কাঁচা সুপারিগুলো ঝরে যাচ্ছিল। ওরা কাঁচা সুপারির ছাল দাঁত দিয়ে ছাড়াচ্ছিল আর কচকচ করে চিবিয়ে খাচ্ছিল। ওদের মুখে ঘা, ঠোঁটগুলো ফেটে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি করে হলো এই সব ঘা? ওরা বলেছিল কাঁচা সুপারির আঠা এইভাবে ঠোঁট ফাটিয়ে দেয়। ওরা ভুলবার চেষ্টা করছিল হিংসার আগুনে ঝলসে যাওয়া দিনগুলিকে। কাঁচা সুপারির রসে ওদের মাথা ঘোরে, আর নেশা হয়। আমি কাঁচা সুপারি খেতে গেলে ওরা বলেছিল "খাস না। তোর নেশা হবে, তোর ঠোঁট ফাটবে রক্ত ঝরবে। তোর তো ঘর পোড়েনি। তুই তো ঘরে ফিরে যেতে পারিস। তোর তো ভয় নেই।"

দেখেছিলাম ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুল ভুলেছে, কিভাবে খাদ্যাভাবে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে, কিভাবে টিবি আক্রান্ত, কিভাবে চর্ম রোগে আক্রান্ত। প্রতিটি সাঁওতাল মানুষের চোখ ছিল শূন্যে, মহাশূন্যে।

এখন ভারতের এমন পরিস্থিতি কেবলই প্রতিহিংসার চাষ হয়েছে দেশ জুড়ে। কত কৌশল বিজেপির! কখনো নোট বাতিল তো কখনও গরু খাওয়া ও গোমাতাকে উলঙ্গ রাখা নিয়ে, কখনো তিন তালাকের চাটনি তো কখন সাধুর লিঙ্গ চৌকিদারির সখ, কখনো তাজমহলের দিকে বিজেপি শিক্ষ নিয়ে ধাবিত হচ্ছে ইমারতকে রেপ করার জন্য তো কখনো মুজাফ্ফরপুরের দাঙ্গা ঘটানো। শয়তানের কত লীলা! কত রঙ্গ মানুষকে নিয়ে কত তামাসা!

আসামের বাঙালি তাড়ানোর মতো দাঙ্গা পৃথিবীর মনে রাখার মতো। এ তো সরকার বনাম বাঙালির দাঙ্গা। জাতি দাঙ্গা তবুও তো থামে কিন্তু সরকারের মতো গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা কি যে কঠিন তা আমরা হিটলারের উদাহরণ থেকে শিখেছি। শিখেছি ব্রিটিশের কাছ থেকে। তাদের চেয়েও কঠিন শিক্ষা আমাদের দেশের সত্তর বছরের গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের বর্তমান সরকারের কাছ থেকে। এক দিন হয়তো এনআরসি-এনআরসি খেলা বন্ধ করবে, নিশ্চয় বন্ধ করবে, কারণ মূলনিবাসী ছাড়া যে কেউই ভারতীয় নই সে কথা প্রমাণ হতে থাকবে। বিজেপি মুখ থুবড়ে নিজের পায়খানাতে পড়ে নিজেরই বিষ্ঠা আহার করতে থাকবে তখন সেই ছাত্র নেতার মত জনগণের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু তত দিনে অগুনতি মেধা আজহারের মতো অথবা মেরুদন্ড ভাঙা প্রিন্সিপ্যালের মতো অকেজো হয়ে যাবে। এইভাবে ভারতের আগামীর মেধাগুলোকে বিকলাঙ্গ করে ভারতকে প্রতিবন্ধী করার খেলায় উন্মত্ত বিজেপি। এখানে কিন্তু লাচিত নেই বেঁচে, মমাইকাটা করার লোক নেই।

ভারতীয়রা সাবধান! স্বাধীনতা সাবধান!